সৈয়দ আহমদ বেরলভীর জন্ম ও শিক্ষা

(১২০১-১২৪৬ হিজরী, ১৭৮৭- ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ = ৪৬ বৎসর)

সৈয়দ আহমদ বেরলভীর জন্ম হয় রায়বেরেলীর এক সৈয়দ পরিবারে পহেলা মহররম ১২০১ হিজরীতে (মির্জা হায়রত দেহলভীর হায়াতে তাইয়েবা পৃঃ ৩৮৭)। বুযুর্গ পিতা সৈয়দ মুহাম্মদ ইরফান প্রথমে ছেলের নাম রাখেন মীর আহমদ। (গোলাম মেহেরের সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ৮৩)। কিন্তু পরবর্তীতে সৈয়দ আহমদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তার খান্দান ইলম ও ইরফানের সুবাদে আশে পাশের এলাকায় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। সৈয়দ আহমদের দাদার দাদা শাহ ইলমুল্লাহ এক প্রসিদ্ধ কামেল বুযুর্গ ছিলেন।

শিক্ষাঃ "সৈয়দ সাহেবের বয়স যখন চার বৎসর চার মাস হয়, তখন হিন্দুস্তানের শরীফ খান্দানের রেওয়াজ মোতাবেক তাকে মক্তবে ভর্তি করা হয়" (মির্জা হায়রত দেহলভীর হায়াতে তাইয়েবা পৃঃ ৩৮৭)।

কিন্তু পড়া শুনায় তার মনোযোগ একেবারেই ছিল না। **এপ্রসঙ্গে তার ভক্ত ও সমকালীন ব্যক্তিত্ব মির্জা হায়রত দেহলভী লিখেছেন-**

"বুযুর্গ সৈয়দ সাহেব বাল্যকালে অস্বাভাবিক নীরবতার কারনে নিম্নমানের নির্বোধ বোকা হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। লোকজনের ধারনা জন্মেছিল যে, তাকে শিক্ষা দেয়া বৃথা। তার দ্বারা কিছু হবে না। আমি (মির্জা) তার মেধা বা স্মরন শক্তির ব্যাপারে কোন রায় দিতে পারবনা। শুধু এতটুকু লিখাই যথেষ্ট মনে করি যে, সৈয়দের বাল্যকালে কেন- ভরা যৌবনেও তিনি লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগী ছিলেন। তার স্বভাব লেখা-পড়ার প্রতি ছিল একদম উদাসীন (মির্জা হায়রত দেহলভীর হায়াতে তাইয়্যেবা পৃঃ ৩৮৯)।

কারিমা পান্দেনামা

সৈয়দ সাহেবের অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা এমন পর্য্যায়ে পৌছেছিল যে, কারিমা কিতাবের প্রথম পংতি (কারিমা বে বখ্শা বর হালে মা) -যা ছিল নিরেট দোয়া বা মুনাজাত- তাও বুযুর্গ সৈয়দ আহমদ সাহেব তিন দিনে মুখস্ত করেছিলেন। এর উপরও মজার ব্যাপার হলো- কখনও কখনও তিনি "কারিমা" শব্দটি ভুলে যেতেন এবং কখনও "বর হালে মা" ভুলে বসতেন এবং তা একদম মন থেকেই মুছে যেতো (মির্জা হায়রত দেহলভীর হায়াতে তাইয়েবা পৃঃ ৩৯০)।

এতদসত্বেও বুযুর্গ পিতামাতা ও ওস্তাদের আপ্রান চেষ্টা ছিল- হয়তো বা সৈয়দ সাহেব বিদ্যার অলঙ্কারে কোন এক দিন সজিজত হয়ে যেতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে মির্জা হায়রত নিজের ভাষায় লিখেছেন-

"সৈয়দ আহমদ যখন একটি বাক্যকে কয়েক ঘন্টা ধরে জপতে থাকতো- তখন

কিছুমাত্র মুখস্ত হতো। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো- পরদিনই তা মন থেকে পূনরায় লাপাত্তা হয়ে যেতো। অবস্থা যখন এমন দাঁড়ালো- তখন পিতামাতা ও মিয়াঁজীর সাবধান বাণী উচ্চারিত হতে লাগলো। ঘরের ধমক চোখ রাঙ্গানী অতিক্রম করে- কখনও মারপিটের পর্যায়ে চলে যেতো। এতেও পিতামাতার ইচ্ছা পূরন হলো না। তারা যখন দেখলেন যে, কুদরতী ভাবেই তার ঘিলুতে তালা লেগে গেছে এবং কোন প্রকার ধমকেই সে পড়তে পারছেনা- তখন বাধ্য হয়ে তারা তাকে লেখাপড়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসলেন" (মির্জা হায়রত দেহলভীর হায়াতে তাইয়্যেবা পৃঃ ৩৯১)।

সৈয়দ সাহেবের এই জন্মগত মেধাহীনতায় যখন পিতামাতা এবং ওস্তাদগণ অপারগ ও ক্লান্ত হয়ে গেলেন- তখন সৈয়দ সাহেবের খোলামেলা ছুটি মিলে গেল। তিনি এখন খেলাধূলা ও উদ্দেশ্য বিহীন ঘুরাফেরা করে দিন কাটাতে লাগলেন।

এব্যাপারে মির্জা হায়রত লিখেছেন -

"পিতামাতা তাকে একেবারেই স্বাধীন করে দিলেন এবং তার ইচ্ছার উপর তাকে এভাবে ছেড়ে দিলেন যে, তার মনে যা চায়- তাই করুক" (মির্জা হায়রত দেহলভীর হায়াতে তাইয়েবা পৃঃ ৩৯১)।

পাঠ্য জীবনের এই তিন বৎসরের ইতস্ততার মধ্যে সৈয়দ সাহেব কি অর্জন করলেন- **তার বর্ণনা আপন ভাগিনার মুখেই শুনুন-**

"তিন বৎসরের এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কোরআনে হাকীমের মাত্র কয়েকটি সূরা পড়েছিলেন এবং হরুফে হেজা লিখা শিখেছিলেন" (সৈয়দ মুহাম্মদ আলীর মাখজানে আহ্‌মদী পৃঃ১২)।

সৈয়দ সাহেবের বিদ্যা শিক্ষার এই ছিল কাহিনী। একে অনারবীয় অনুমান ও রং চং মাখিয়ে কিসের থেকে কি বানিয়ে দিল। (তাকে উম্মীর মর্যাদা দেয়া হলো)। সৈয়দ সাহেব মূলতঃ দুষ্ট ছিলেন না এবং এমন মেধাবীও ছিলেন না যে, দুষ্টামী বুদ্ধি মাথায় গজাবে। অন্যের হাসি তামাশাও তিনি বুঝতেন না। তিনি মানুষের ঘরে বিনা বাধায় চলে যেতেন- যেরূপ সাধারনতঃ বড় বয়সের অবুঝ ছেলেরা করে থাকে। তার অবুঝের কারণে মহিলারাও বাধা দিতনা। বরং তাকে দিয়ে লাকড়ী ইত্যাদি জিনিস আনিয়ে নিত। তার বড় ভাইয়েরা এবং খান্দানের লোকেরা তার এই আচরনকে আহাম্মকী মনে করে তাকে বাধা দিতেন। পিতামাতা তার এই অতিরিক্ত অবুঝের কারনে চিন্তিত থাকতেন।

এপ্রসঙ্গে মির্জা হায়রত দেহলভী লিখেছেন-

"সৈয়দ সাহেবের বুযুর্গ পিতামাতা, চাচা- প্রমুখগণের এ ব্যাপারে কোন চিন্তা ভাবনাই ছিলনা যে, এই ছেলে বড় হয়ে আমাদের দায়ীত্ব কাধে তুলে নিতে পারবে। বরং তাদের চিন্তা ছিল একটাই- "আমরা যে সুনাম অর্জন করেছি এবং আমাদের পূর্ববর্তী মুরুব্বীরা শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে যে সম্মান অর্জন করে গেছেন, তার অথর্বতার কারনে না জানি তা চির বিদায় হয়ে যায়" (মির্জা হায়রত দেহলভীর হায়াতে তাইয়েবা পৃঃ ৩৯০)।

সৈয়দ সাহেব এই অথর্ব অবস্থায় নিজ জীবনের ১৭টি মনজিল (বৎসর) অতিক্রম করলেন এবং কবির ভাষায় বলতে হয়-

মেযাজে তু আজ হালে তিফলী না গাশ্‌ত।

অর্থ ঃ তোমার মেজাজ হতে তো এ পর্যন্ত বালখিল্লতাই গেলনা (সেখ সাদী)।

অর্থাৎ শেখ সাদীর উক্তি মোতাবেক তাকে এখনও নিজ অভ্যাসে ও চালচলনে সেই চার বৎসর চার মাস চার দিনের বয়সের শিশুর মতই মনে হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যেই তার বুযুর্গ পিতা জনাব সৈয়দ মুহাম্মদ ইরফান নশ্বর জগত ত্যাগ করে চলে গেলেন।

জনব গোলাম রসুল মেহের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কারণে সৈয়দ সাহেবকে কাফিয়া ও মেশকাত পর্যন্ত লেখাপড়া আলেম বানানোর প্রচেষ্টায় নিজ কলিজা পানি করে ফেলেছেন। কিন্তু অগত্যা শেষ পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন-

"আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও সৈয়দ সাহেবের তবিয়ত বিদ্যার্জনের দিকে ফিরেনি। তিন বৎসর লাগাতার মক্তবে যাতায়াত করতে থাকেন, কিন্তু এই সময়ে কোরআন হাকীমের মাত্র কয়েকটি সূরা হিফজ করতে সক্ষম হন এবং আরবী বর্ণমালা ছাড়া বাক্য লিখতে সক্ষম ছিলেন না। তাঁর বড় ভাই সৈয়দ ইবরাহীম ও সৈয়দ ইসহাক বারবার পড়ার তাকিদ দিতেন। কিন্তু মনে হয়- বুযুর্গ পিতা এই তাকিদকে শুণ্যফল বলেই মনে করে নিয়েছিলেন।" (গোলাম রসুল মেহেরের সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ৬১)।

সৈয়দ সাহেবের শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে জনাব মেহের সাহেবের যে গবেষনা ছিল- তা তিনি নিজেই হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়ে লিখেছেন এভাবে- **"নিশ্চিত যে, বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে হয়তো চেষ্টার কোন ত্রুটিই করা হয়নি।"** (গোলাম রসুল মেহেরের সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃঃ ৬১)।

জনাব মেহের সাহেবের গবেষণা ও অনুসন্ধানের স্বরূপ ও তার উক্তি- "কোন ত্রুটিই করা হয়নি" দ্বারাই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ভক্তি যে "অন্য এক বস্তু"! পিতামাতার চেষ্টা সব নিষ্ফল হয়েছিল।